# সম্পাদক সমীপেষু: প্রজন্ম পেরিয়ে

আনন্দবাজার পত্রিকা,২১ মে ২০২১ ০৪:৪৭

শিলাদিত্য সেনের ‘সত্যজিৎ, মৃণাল, ও একটি ছবি’ (১৪-৫) পড়ে বেশ কিছু কথা মনে পড়ে গেল। সত্যিই, এক পরিচালকের একটি ছবি নিয়ে অন্য সমকালীন পরিচালকের এত ব্যক্তিগত অনুভূতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা খুবই উদারতার পরিচয়। এবং খুবই ব্যতিক্রমী। যখন মৃণাল সেন লিখিত তৃতীয় ভুবন বইটি পড়েছিলাম, তখন এই অংশটি খুবই হৃদয়গ্রাহী লেগেছিল। অপরাজিত সিনেমাটি জনপ্রিয় না হলেও তা বিদগ্ধজনের কাছে উচ্চ প্রশংসিত। বেঙ্গালুরুতে আদুর গোপালকৃষ্ণনের কাছেও একই কথা শুনেছি। সে বার উদ্বোধনী বক্তৃতায় আদুর জানালেন, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি সত্যজিৎকে জানিয়েছিলেন তাঁর সবচেয়ে পছন্দের সিনেমা অপরাজিত। সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, তাড়াহুড়োতে অপরাজিত-র কিছু অংশ ভাল পরিমার্জন করা সম্ভব হয়নি। আদুর প্রায় তাঁকে হাতে ধরে জানিয়েছিলেন, “মানিকদা, কিচ্ছু করার দরকার নেই। ওই ছবি সম্পূর্ণ, ওর একটা ফ্রেমকেও ছুঁয়ে দেখার দরকার নেই।”

আর ওই যে কথাটা লিখেছেন, “বিশের দশকের কাহিনি... সত্যজিৎবাবু ছবি করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে এসে, সেই ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করল একদল তরুণ-তরুণী আশির দশকের মাঝামাঝি। কী আশ্চর্য! সমস্ত সময়ের সীমারেখা মুছে ফেলে অপরাজিত হয়ে উঠেছে সমকালীন ভাষ্য, সাম্প্রতিকের চিহ্ন”— এ আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ২০১৮-তে আমার ছেলেকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে বসে সিনেমাটি দেখতে গিয়ে দেখেছি, তার চোখেও উজ্জ্বল অনুভূতি। ঠিক একই ভাবে সে যেন অপুর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। শিকাগোর তরুণ-তরুণীদের মতোই তার কাছে এসে ধরা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ। প্রায় শতবর্ষে কিছু অনুভূতি চিরন্তন থেকে গিয়েছে। তবে আমার কিন্তু অপরাজিত-র চাইতে আরও বেশি প্রিয় অপুর সংসার। অপর্ণার উপস্থিতি যেন অপুকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আর শেষ দৃশ্যে কাজলকে নিয়ে ‘অপরাজিত’ অপূর্বের যাত্রার সেই চিরকালীন ছবি আমার মন জুড়ে থাকে।

ভাস্কর বসু

**বেঙ্গালুরু**

সমকাল, চিরকাল

‘সত্যজিৎ, মৃণাল, ও একটি ছবি’ প্রবন্ধে মৃণাল সেনের দৃষ্টিতে সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত সিনেমা সমসাময়িক না হয়েও সর্বকালীন হওয়ার কথা যথার্থই বলেছেন শিলাদিত্য সেন। কলেজে পড়ার সময় সাহিত্যের ক্লাসে স্যর ‘ক্লাসিকস’ এবং ‘বেস্টসেলার’-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রথমটি ‘সময়ের পরীক্ষা’ আর দ্বিতীয়টি ‘সময়ের স্বাদ’। সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত-সহ আরও অনেক ছবি যতটা না সমসাময়িক সময়কে তুলে ধরে, তার চেয়ে বেশি সেই সময়কে অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবন-দর্শনের দলিল হয়ে ওঠে। তাঁর সময়ে অনেক সিনেমা-নির্মাতা সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা— দেশভাগ, দাঙ্গা, যুদ্ধ, মন্বন্তর নিয়ে ছবি বানিয়েছেন, সে সব ছবির কিছু ‘ক্লাসিক’ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, অনেকগুলো হয়নি। সত্যজিৎ রায় সিনেমাকে শিল্পের এমন

একটি স্তরে উন্নীত করেছিলেন, যার পরতে পরতে ছিল মানুষের চিরন্তন অনুভূতি এবং চিন্তনের খোরাক। তাই, অপরাজিত সিনেমায় মায়ের আঁচলের মায়া কাটিয়ে অপুকে জ্ঞানালোকের জগতে পাড়ি দিতে হয়। এই ছবিতেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অপুকে বলেছিলেন, "পৃথিবীর এক কোণে পড়ে থাকলেও মনটাকে যে কোণঠাসা করে রাখতে হবে, এমন তো নয়।" উন্নত শিক্ষার জন্য শহরে, এক শহর থেকে দেশের অন্য শহরে, কিংবা দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়েছেন, পাকাপাকি ভাবে থেকেও গিয়েছেন সন্তানরা। অন্য দিকে, গ্রামের বাড়িতে, কিংবা শহরের ফ্ল্যাটে সেই সব বাবা-মা নিঃসঙ্গ, একলা জীবন কাটান। এই সুর পথের পাঁচালী সিনেমায় বেশ কয়েক বার বেজেছে। এই বাস্তব চিত্র আজও একটুও বদলায়নি। কিন্তু, এই দোলাচলের মধ্যেও যুগের প্রগতির চিরন্তন ধারাকে সত্যজিৎ রায় এড়িয়ে যেতে চাননি। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসটিও শেষ হচ্ছে অমোঘ সেই কথা দিয়ে, "সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!... চলো এগিয়ে যাই।"

অরুণ মালাকার

কলকাতা-১০৩

## শিকড়ের টান

'সত্যজিৎ, মৃণাল, ও একটি ছবি' নিবন্ধটি অনেক দিন পরে ফের শিকড়ের টান অনুভব করাল। হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া থেকে আধুনিক শিক্ষার জন্য কলকাতা এসে পটুয়াটোলা লেন, কলেজ স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রিটের আশেপাশে বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে হেঁটে বেড়াত এক কিশোর। ১৯৮৬ সালে এক রবিবার সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের মেন হস্টেলের সাদা-কালো টিভির পর্দায় অপরাজিত দেখল সে। সেই প্রথম বার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল লুকানো ঝর্নার ধারা। কাটোয়া লাইনের কয়লার ইঞ্জিনের রেলগাড়ির শব্দ, ইস্টিশনের টিকিট ঘর, ডাউন হওয়া সিগন্যালের সবুজ কাচের আলো— তিন মাস ধরে পড়াশোনার প্রবল চাপে বাড়ি না যেতে পারার কৈফিয়ত 'শ্রীচরণেষু মাকে'— সব হুড়মুড়

করে ভেঙে বার করে নিয়ে এল শিকড়গুলো। সেই রাতেই হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রিট, হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়া স্টেশনে। রাত ১২টায় আর ট্রেন নেই। সাড়ে তিনটের ট্রেন ধরে পৌঁছে গেলাম গুপ্তিপাড়া। আমের মুকুলের গন্ধে ভরা আমাদের পুরনো, ভাঙা পাঁচিলের বাড়িতে। তখন ফুটছে ভোরের প্রথম আলো। দরজা খুলেই মা। "কী হল, এত সকালে কোথা থেকে?" "এমনিই চলে এলাম মা ছুটি পেয়েছি।"

সুব্রত গোস্বামী

কলকাতা-১৫৬

## জোয়ার-ভাটা

দেবেশ রায় তাঁর শরীরের সর্বস্বতা গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন, "একটু বেশিদিন বেঁচে-থাকা ও লিখতে লিখতে বেঁচে-থাকার মধ্যে জোয়ার-ভাটার খেলা ঘটতে থাকে। জোয়ার মানে তো নদীর বিপরীত গতির প্রবলতর স্রোত নদীর ভিতর ঢুকে পড়া। আর, ভাটা মানে তো সেই প্রবলতার বিপরীত স্রোতের নদীস্রোতের অনুকূলেই ফিরে যাওয়া। নদীস্রোতের উজানে যেতে হলে, জোয়ারের জন্য বসে থাকতেই হয়। নদীস্রোতেই ভাসতে হলে, ভাটার জন্যও অপেক্ষায় থাকতে হয়।" প্রয়াণের প্রথম বর্ষপূর্তিতে (১৪ মে) তাঁর অজস্র লেখমালার সামনে মাথা নত হয়ে আসে। তা হলে কি তিনি জীবন নদীর জোয়ার-ভাটার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন! অতিমারির থাবায় যখন শুরু হল মৃত্যুমিছিল, তাতে শামিল হলেন আমাদের অতি প্রিয় স্বজন, অভিভাবক। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরুণ সেন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, এবং শঙ্খ ঘোষ। বাঙালি মেধা ও মননকে রিক্ত নিঃস্ব করে এই চলে যাওয়া। তবু যেন মনে হয় ধ্বংসস্তূপে আলোর মতো এঁদের সমস্ত কীর্তি। দেবেশ রায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে দেদীপ্যমান গোটা মানুষটাই। তিনি যে তাঁর লেখার মধ্যেই দৃশ্যমান, আকাশলীন এক অগ্নিপুরুষের মতো।

সুশীল সাহা

হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা

**আস্থা**

গত ২৫ এপ্রিল আমার ৬২ বছরের ডায়াবেটিক, কোভিড-আক্রান্ত বাবাকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করি। জুনিয়র ডাক্তাররা এত সহানুভূতি নিয়ে কথা বলতেন যে, টেনশন অনেক কমে যেত। সিনিয়র ডাক্তারবাবু নিয়মিত বাবার শারীরিক অবস্থা আমাদের জানাতেন। বারো দিন পর বাবাকে বাড়িতে এনেছি। আয়াদের হাজার তিনেক টাকা ও অন্যান্য সামান্য খরচ বাদে আর কিছুই লাগেনি। সরকারি হাসপাতাল নিয়ে ভয় ছিল। আজ সে ধারণা ভেঙে গিয়েছে। বাবা এখন ভাল আছেন।

অনিমা দাস

কলকাতা-২

Reference:

https://www.anandabazar.com/editorial/letters-to-the-editor/letters-to-the-editor-remembering-satyajit-ray-on-his-birth-centenary/cid/1282232